পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা

১৭ই, মাঘ, ১৩৮৪ বাংলা : ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং : ২১শে সফর, ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩১শে জানুয়ারী
১৯৭৮ ইং

৩১শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'নামায-শর্তাবলী ও আদব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৮
০ অমৃতবাণী : "ঈমানে জ্যোতির্ময় হৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইসলাম প্রচারে সক্ষম'	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী(আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১০
০ জামাত আহ্‌মদীয়ার ৮৫তম সালানা জলসা হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌র সালেস (আইঃ)-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের ভাষণ :	: মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১২
০ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা	মূল : হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৪

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার

৫৫ তম সালানা জলসা

তারিখ : ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই মার্চ ১৯৭৮ ইং

বংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসা আগামী ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই মার্চ ১৯৭৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্‌। জলসার সার্বিক কামিয়াবীর জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ খাসভাবে দোওয়া করিবেন। জলসার জন্য প্রত্যেক জামাত এবং ব্যক্তিবিশেষকে জলসা কমিটির চেয়ারম্যান সাহেবের পক্ষ হইতে পত্র দেওয়া হইয়াছে। তদানুযায়ী সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি নিজেদের চাঁদা সত্বর কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধিকারী হউন। আমিন।

উল্লেখ্য, মহ্‌তারম আমীর সাহেব ২৭/১/৭৮ তারিখে ঢাকায় মঙ্গলমত প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

শোক সংবাদ

আহমদনগর (দিনাজপুর) নিবাসী মুন্সী কুদরতুল্লা সাহেব গত ১১/১/৭৮ ইং রোজ বুধবার সন্ধ্যা ৭—১৫ মিনিটের সময় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স ছিল ৮৬ বৎসর। তিনি একজন প্রবীণ মুখলেস আহমদী ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র মৌঃ আনিসুর রহমান সাহেব (শাহেদ ইংল্যাণ্ড) জামাত আহ্‌মদীয়ার মুবাল্লেগ হিসাবে ইসলাম প্রচার কাজে নিয়োজিত আছেন। মরহুম মুনশী সাহেবের একমাত্র জামাতা মৌঃ ইসমাইল বোখারী জামাতের মুয়াল্লেম (ওকফে জদীদ) হিসাবে সেলসেলার খেদমত করিতেছেন। আল্লাহতায়ালা মরহুমকে মাগফেরাত ও জান্নাতে উচ্চস্থান দান করুন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন ও তাহাদের হাফেজ ও নাসের হউন। আমিন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা

১৭ই মাঘ, ১৩৮৪ বাং : ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং : ৩১শে সুলাহ্, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১) সর্বাপেক্ষা বড় যিকর হইল—বিসমিল্লাহের রহমানির রাহিম। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে যখন তোমরা কোন কাজ আরম্ভ কর, তখন প্রথমেই বিসমিল্লাহ পড়িয়া লও। বিসমিল্লাহ ছাড়া কাজ বেবরকত হইয়া যায়। কাপড় পরিতে বিসমিল্লাহ পড়িবে, জুতা পড়িতে বিসমিল্লাহ পড়িবে, পানি পান করিতে বিসমিল্লাহ পড়িবে, বাসন মাজিতে বিসমিল্লাহ পড়িবে, জীব জবাই করিতে বিসমিল্লাহ পরিবে, গোস্ত পাক করিতে বিসমিল্লাহ পড়িবে, এক কথায় যে কোন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ পড়িবে। বিসমিল্লাহ কালামের মধ্যে এই শিক্ষা রহিয়াছে যে দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে সকলই আল্লাহর, এবং তাঁহার অনুমতি মূলে এ সবকে ব্যবহারে আনিতেছি। যথা, কোন জীব জবাই করার সময় আমরা বিসমিল্লাহ পড়িয়া ইহাই বলি যে আমরা ইহা কাহারও নিকট হইতে ছিনাইয়া লই নাই। ইহার মালিক আল্লাহ্। তিনি খাইবার অনুমতি দিয়াছেন, তাই ইহাকে যবেহ্ করিতেছি। এইভাবে মরিচ, কয়লা, বাসন সব কিছু তাঁহার দেওয়া বস্তু। আমরা তাঁহার স্বত্বাধিকারে বস্তু সমূহ হইতে খাতক হিসাবে উপকার গ্রহণ করিয়া থাকি। হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তিনি অতি উত্তম খানা খাইতেন এবং উত্তম পোষাক পরিতেন। কোন কোন লোক এ সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করিলে, তিনি বলিলেন, আমি কি করিব,

খোদাতায়ালা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে না বলেন, হে আব্দুল কাদের জিলানী, তোমাকে আমার স্বত্বার কসম, তুমি খাও, ততক্ষন পর্যন্ত আমি খাই না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি বলেন যে, হে আব্দুল কাদের জিলানী, তোমাকে আমার স্বত্বার কসম, তুমি এ পোষাক পর, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি উহা পরি না। সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)-কে খোদাতায়ালা ঐরূপ করিতে বলিতেন কিন্তু প্রত্যেক মুসলমান কাজ করার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ পড়ে, তখন সে আল্লাহতায়ালার আদেশে সেই কাজ করে. এমন কি প্রত্যেক খানা খোদাতায়ালার আদেশে খায় এবং প্রত্যেক কাপড় সে আল্লাহতায়ালার আদেশে পরে।

(২) দ্বিতীয় যিকর হইল 'আলহামদো লিল্লাহ্'। প্রত্যেক কাজের সফল সমাধা অন্তে এই কলেমা পাঠ করা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, (সুরা ইউনুস : ১ রুকু) واخر دعوهم ان الحمد لله رب العلمين—"মোমেনগণের শেষ কথা—সকল প্রসংশা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সারা বিশ্বের অধিপতি"।

(৩) তৃতীয় যিক্‌র হইল সুবাহানাল্লাহ। সর্ব প্রকার বড় এবং বিস্ময়কর কাজ দৃষ্টে ইহা পাঠ করা হয়। মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে এই কলেমার মধ্যেও বড় হিকমতের কথা পাওয়া যাইবে।

(৪) বিপদের সময়ে ইসলাম انا لله وانا اليه راجعون পাড়তে শিখাইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে আমরাও তাঁহারই এবং পরিণামে আমাদিগকেও তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। কোন আত্মীয় পাইয়া থাকিলে, আল্লাহর নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। যখন তিনি তাহাকে ফিরাইয়া লইয়াছেন, তখন দুঃখের কোন কথা নাই, আমরাও তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইব। একটি গেলাস ভাঙিলেও এই কলেমা পাড়িয়া স্বীকৃতি জানাই যে গেলাস আল্লাহই দিয়াছিলেন, উহা ভাঙিয়া থাকিলে কোন দুঃখ নাই, কারণ আমরাও আল্লাহর নিকট ফিরিয়া যাইব এবং তাঁহার নিকট বহু গেলাস আছে।

(৫) কোন অশ্লীল কথা শুনিলে বা অশ্লীল দৃশ্য দেখিলে ইসলাম আমাদিগকে لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم—কলেমা পাঠ করিতে শিখাইয়াছেন। অর্থাৎ, "অতি উচ্চ এবং মহান আল্লাহ ব্যতিরেকে পরিবেষ্টনকারী ও শক্তির অধিকারী নাই"।

(৬) মনে কোন পাপ কর্মের বাসনা জাগিলে, استغفر الله কলেমা পড়িতে হয়। ইহার অর্থ, "আমি শয়তানের আক্রমণ হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

(৭) اعوذ بالله আর একটি যিক্‌র। যে সব গুরুত্বপুর্ণ কাজ সমাধা করার পথে শয়তানী বাধার সম্ভাবনা, উহাদের প্রত্যেকটি আরম্ভ করার পূর্বে এই কলেমা পাঠ করিতে হয়। যথা—কুরআন করীম পাঠ করা এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যেহেতু শয়তান বাধার সৃষ্টি করে সেইজন্য আল্লাহতায়ালা কুরআন করীম পাঠের পূর্বে এই কলেমা পাঠ করিবার আদেশ দিয়াছেন। فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله (সুরা নহল : ১৩শ রুকু)

(৮) শুইবার সময়ও যিক্‌রের ব্যবস্থা আছে। এ সম্বন্ধে আয়তুল কুরসী এবং তিন কুল পড়িয়া বুকের উপর ফু দিবার নির্দেশ আছে।

(৯) ঘুম ভাঙ্গিলে এক দোওয়া পড়িতে হয়। যথা :—الحمد لله الذى احيانا بعد ما اماتنا و اليه النشور অর্থাৎ "সকল প্রশংসা তাঁহার, যিনি আমাকে মৃত্যু দিবার পর জীবিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে।"

(১০) অনুরূপভাবে পীড়িতের জন্য দোওয়া আছে এবং আরোগ্য লাভের পরও পড়িবার দোওয়া আছে।

(১১) পায়খানা যাইতে কত ঘৃণা বোধ হয়। কিন্তু উহার জন্য উপযোগী দোওয়া আছে : اللهم انى اعوذبك من الخبث والخبائث—"হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আশ্রয় মাগিতেছি সর্বপ্রকার অপবিত্রতা ও অপবিত্রত বস্তু হইতে।"

(১২) গোসল করিবারাও যিকর আছে।

(১৩) স্বামী-স্ত্রী সহবাসের উপলক্ষেও পাঠ করিবার দোওয়া আছে। যথা—اللهم جنبنى الشيطان و جنب الشيطان من ما رزقتنا—"হে আল্লাহ, আমাকে শয়তানের স্পর্শ হইতে দূরে রাখ এবং তুমি আমাদিগকে যে উপজীবিকা দিয়াছ, উহাকেও শয়তানের নিকট হইতে দূরে রাখ।"

মোটকথা, মানব জীবনের এমন কোন অংশ নাই, যে অবস্থার জন্য কোনও না কোনও প্রকার দোওয়া নির্ধারিত নাই।

ইহা ব্যতিরেকে ইসলাম আরও অন্য প্রকারের দোওয়া নির্ধারিত করিয়াছে। যথা—

(১) তাফাক্কুর—মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা। ইহা আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব পর্যন্ত পৌঁছাইতে সক্ষম। এই চিন্তাধারায় বুদ্ধি ও দার্শনিক প্রেরণা সঞ্জাত হইয়া থাকে।

(২) শুক্‌র—কৃতজ্ঞতা। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন : ان شكرتم لازيدنكم অর্থাৎ 'কৃতজ্ঞ হইলে পুরস্কার বাড়াইয়া দিব।" (সুরা ইব্রাহীম : ১ম রুকু) কৃতজ্ঞতার প্রেরণা চিন্তাকে সাহায্য করে এবং আল্লাহর নৈকট্যের দ্বারকে মানুষের উপর খুলিয়া দিতে থাকে।

(৩) তাযাক্কুর—মনন অর্থাৎ কোন অতীত ঘটনাকে স্মরণ করিয়া উহা হইতে পরিণাম বাহির করা। ইহাও অন্তরকে শুদ্ধ করার এক প্রকৃষ্ট পন্থা।

(৪) শউর—হুঁশ। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যে, সকল বাসনা-কামনা আছে, সেগুলিকে চিন্তা করিয়া প্রকাশ করাকে হুঁস কহে। প্রকৃতির মধ্যে বহু অনুভূতি ও বাসনা আছে সেগুলিকে যদি আমরা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করি, তাহা হইলে সেগুলি আমাদের বহু উন্নতির উপায় হইতে পারে।

(৫) এল্‌ম—বিদ্যা। দুনিয়ার মানুষের অভিজ্ঞতার নাম। এতদ্ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে অন্যদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা উপকার লাভ করিয়া থাকি। অন্যদের কাজের কুফল দেখিয়া সেই সব কাজ হইতে আমরা দূরে থাকিয়া ক্ষতি হইতে বাঁচিতে পারি এবং কাজের সুফল দেখিয়া সেই সব কাজ করিয়া উপকৃত হইতে পরি।

(৬) ফেকাহ—ইহা মানুষকে সৎ কাজের দিকে পরিচালিত করে। কুরআন করীমে আছে لَا تَفْقَهُونَ। ফেকাহ ঐ জ্ঞানের বিষয়কে বলে, যেগুলি প্রকাশ্যভাবে প্রমাণিত এবং উহার সহিত উহাদের আভ্যন্তরীণ প্রভাব চিন্তা করি। দার্শনিক বিষয়গুলি চিন্তার অন্তর্ভুক্ত এবং জ্ঞানের বিষয় ফেকাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত।

(৭) আক্কেল—বুদ্ধি। বুদ্ধি করিয়া কাজ করিলে, মানুষ ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে। ইহা মানুষকে মন্দ হইতে রুখিয়া দেয়। মোটর যেরূপ ব্রেক হয়, সেইরূপ ইহা মানবমস্তিষ্কের ব্রেক স্বরূপ।

(৮) এবসার—অন্তর্দৃষ্টি। কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন—افلا تبصرون অন্তরদৃষ্টি দ্বারা বড় বড় বিষয় পরিষ্কার হইয়া যায় এবং মানুষ নিজের সংশোধন করিতে পারে।

(৯—১০) রুইয়েত ও নযর। উভয় শব্দের মোটা অর্থ হইল দেখা। কিন্তু রুইয়েত ঐরূপ দেখাকে বলে, যাহার সহিত আত্মিক চেতনা সংযুক্ত থাকে এবং নযর ঐরূপ দেখাকে বলে, যাহার সহিত চিন্তা সংযুক্ত থাকে।

মোট কথা, উপরে বর্ণিত দশটি বিষয় ইসলামী এবাদতের অংশ, যে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। দুনিয়ায় আর কোন মযহব নাই, যাহার মধ্যে এই এবাদতের একটি মাত্রও বর্ণিত হইয়াছে।

যাকাত ঃ ফরয, নফল এবং নির্ধারিত ও অনির্ধারিত নামাযের পর এখন যাকাত সম্বন্ধে বলিব। এ সম্পর্কে কুরআন মজিদে এরূপ বিশদ বর্ণনা আসিয়াছে যে অন্য কোন গ্রন্থে ইহার দৃষ্টান্ত নাই। অবশ্য বাইবেলে একদশমাংশ দানের আদেশ আছে এবং হিন্দু শাস্ত্রে

দান খয়রাতের নির্দেশ আছে। কিন্তু কুরআন করীমে যাকাত সম্পর্কে যেরূপ বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে সেইরূপ উহাদের মধ্যে নাই।

(১) ইসলামের এ সম্পর্কে মৌলিক শিক্ষা হইল, সকল সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব একমাত্র আল্লাহতায়ালার। কুরআন করীমে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন: لله ملك السموات والارض (সুরা মায়েদা, ১৬শ রুকু: এমরান, ৯ম রুকু)। "আসমান সমূহ এবং যমীনের স্বত্ব স্বামিত্ব একমাত্র আল্লাহতায়ালার। অন্য কাহারও নহে।"

(২) এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় সূত্র হইল—সকল সম্পত্তি আল্লাহতায়ালা স্বীয় বান্দাগণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৩) তৃতীয় সূত্র হইল—আল্লাহতায়ালার সকল সম্পত্তিতে সকল বান্দার হক শামিল আছে, যেরূপ জয়েন্ট পার্টনারশিপ গ্রামে হইয়া থাকে।
কিন্তু ইহাতে কাহারও অংশ বেশী হইয়া থাকে এবং কাহারও কম। আল্লাহতায়ালা এরূপ করেন নাই। তিনি তাঁহার সম্পত্তিতে সকলের হক সাম্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত করিয়াছেন।

উপরোক্ত তিনটি সূত্রের ফলে প্রশ্ন উঠে, যখন সকল সম্পত্তির উপর সকলের হক আছে, তখন ঐ হক কিভাবে লাভ করিতে হইবে। যথা—আমেরিকায় এক পাহাড় আছে। উহাতে আমার অংশ আছে। আমি বাঙলাদেশে অবস্থান করি। ঐ পাহাড়টিকে আমেরিকা-বাসীগণ দখল করিয়া বসিয়া আছে। উহাতে আমার অংশ কিভাবে আদায় করিব। এই সমস্যা সমাধানের জন্য—

(৪) চতুর্থ যে সূত্র পেশ করিয়াছে উহা হইল এই যে দখলকার ও ব্যবহার কারীর কিছু বেশী হক থাকে। আমেরিকাবাসীগণ যখন ঐ পহোড়টি দখল করিয়া ব্যবহার করিতেছে তখন তাহারা কতকগুলি শর্তে তাহাদের দখল কায়েম রাখিতে পারে। শর্তগুলি হইল নিম্নরূপ:

(ক) দখলকারকে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহাতে অন্যেরও হক আছে।

(খ) যদি দখলকারের নিকট তাহার ন্যায্য অংশের অতিরিক্ত সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে অন্যদেরকে সে এক ক্যাপিটেল লেভী দিবে। ইহার ব্যবস্থা এই যে আমদানীর মধ্য হইতে শতকরা চল্লিশ ভাগের একভাগ অংশ অন্যদেরকে সে আদায় করিয়া দিবে। এইরূপ একবার দিলে চলিবে না। এইরূপ বরারব দিতে হইবে। কিন্তু বরাবর বলিতে অশেষ কাল তক নহে। চল্লিশ বৎসরের দখলে যদি সে চল্লিশ বৎসর যাবৎ বরাবর একের চাল্লিশ

অংশ করিয়া দিয়া দেয়, তাহা হইলে ঐ সম্পত্তি মুল হকদারগণ পুরা পাইয়া যাইবে এবং পরবর্তী আয় বাড়তি হইবে। এই দুইটি বিষয়কে যাকাত কহে।

(৫) ইসলাম পঞ্চম সূত্র যাহা নির্ধারিত করিয়াছে, উহা হইল এই যে কোন ব্যক্তি টাকার আকারে অর্থ জমা করিতে থাকিবে না। উহাকে সদা ঘূর্ণায়মান রাখিবে, যাহাতে উহা হইতে সকলে উপকার হাসিল করিতে পারে।

(৬) ষষ্ঠ সূত্র হইল এই যে, যাকাত দিবার পরও গরীবদের দেখার ভার ধনীদের জিম্মায় থাকে। ইসলামের শিক্ষা এই যে, কেহ অভাবী থাকিয়া গেলে, তাহাকে দেখার ভার তোমাদের উপর। কেয়ামতের দিন তিনি তোমাদিগকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিবেন। হাদিসে বর্ণিত আছে যে কেয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা তাঁহার কোনো কোনো বান্দাকে বলিবেন, আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছি এই জন্য যে আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম তুমি আমাকে খানা খাওয়াইয়াছিলে, আমি পিপাসাতুর ছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করাইয়াছিলে, তুমি আমাকে কাপড় পরাইয়াছিলে, অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলে। ইহাতে বান্দা এস্তেগফার পড়িবে, এবং বলিবে, হে খোদা! তুমি কোথায় এবং আমি কোথায়? ইহা কিভাবে হইতে পারে যে তুমি ক্ষুধার্ত, পিপাসাতুর, উলঙ্গ এবং অসুস্থ ছিলে? খোদাতায়ালা বলিবেন, হে বান্দা। যখন তোমার নিকট এক গরীব বান্দা আসিয়াছিল, তুমি তাহাকে খানা খাওয়াইয়াছিলে, তখন যেন আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম এবং আমাকে তুমি খানা খাওাইয়াছিলে, এবং যখন তোমার নিকট আমার এক গরীব উলঙ্গ বান্দা আসিল এবং তুমি তাহাকে কাপড় পরাইলে, তখন যেন আমি উলঙ্গ ছিলাম এবং আমাকে তুমি কাপড় পরাইয়াছিলে। এবং যখন তোমার নিকট আমার এক পিপাসাতুর বান্দা আসিয়াছিল এবং তুমি তাহাকে পানি পান করাইয়াছিলে, তখন যেন আমি পিপাসাতুর ছিলাম এবং তুমি আমাকে পানি পান করাইয়ছিলে, এবং যখন আমার এক বান্দা অসুস্থ হইয়াছিল এবং তাঁহার সেবা করার জন্য গিয়াছিলে, তখন যেন আমি অসুস্থ ছিলাম এবং তুমি আমার সেবা করার জন্য গিয়াছলে, পক্ষান্তরে আল্লাহতায়ালা তাহার কোন কোন বান্দাকে বলিবেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে খানা খাওয়াও নাই, আমি পিপাসাতুর ছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করাও নাই, আমি উলঙ্গ ছিলাম, তুমি আমাকে কাপড় পরাও নাই, আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা কর নাই। তখন বান্দা বলিবে, হে খোদা। এরূপ কখন ঘটিয়াছিল? তুমি বড়ই শোনাওয়ালা খোদা! তুমি ক্ষুধা, পিপাসা, রোগ এবং উলঙ্গতার উর্ধে, তুমি এ সব হইতে পবিত্র তখন আল্লাহতায়ালা বলিবেন, যখন তোমার নিকট আমার ক্ষুধার্ত, পিপাসাতুর, উলঙ্গ এবং অসুস্থ

বান্দাগণ আসিয়ালি, তখন তুমি তাহাদিগের প্রতি যত্নবান হও নাই। ইহাতে তুমি যেন আমার প্রতি যত্নবান হও নাই। অতএব আজ তুমি যাও এবং তাহার শাস্তি গ্রহণ কর। সুতরাং কেবল যাকাত দেওয়ার প্রশ্ন নাই। যদি যাকাত দেওয়ার পরও কোন গরীব ব্যক্তি নযরে পড়ে, তাহা হইলে ইসলাম তাহার খবর গ্রহণ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয করিয়াছে।

(৭) পুনঃ ইসলাম বিভিন্ন প্রকারের ভুল ভ্রান্তির কাফ্ফারার জন্য গরীবদিগের সাহায্য নির্ধারণ করিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গোলামকে আযাদ করার ব্যবস্থা দিয়াছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপের কাফ্ফারার জন্য তাহাদিগকে খানা খাওয়ান, কাপড় পরান ইত্যাদি বাধ্যকর নির্ধারণ করিয়াছে।

(৮) এতদ্ব্যতিরেকে ইসলাম প্রত্যেক নূতন নূতন এবাদতের ক্ষেত্রে গরীবের হক রাখিয়াছে। যথা—আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন যে তিনি তোমাদিগকে রোযা রাখার ক্ষমতা দিয়াছেন, অতএব তোমরা গরীবদের খানা খাওয়াও, ঈদ উপলক্ষে গরীবদেরকে সদকা দাও এবং হজে যাইতে গরীবদের খেয়াল রাখিও।

(৯) বিজয় উপলক্ষেও ইসলাম গরীবদের হককে উপেক্ষা করে নাই, বরং প্রাপ্ত ধনের মধ্যে গরীবদের অংশ স্থির করিয়া দিয়াছে।

(১০) পুনঃ সন্তান জন্মিলে ইসলাম আকীকা করিবার ও গরীবদিগকে খাওয়াইবার আদেশ দিয়াছে।

(১১) বিবাহ উপলক্ষে ওলীমা করার এবং গরীবদের খাওয়াইবার আদেশ দিয়াছে।

(১২) কোন ব্যক্তি মারা গেলে তাহার সম্পত্তির বন্টন ছাড়া, তাহার মাল হইতে একাংশ এতীমদিগকে দিবার আদেশ দিয়াছে।

(১৩) প্রত্যেক নূতন ফসল ফলিলে বা বৃক্ষে ফল ধরিলে, উহারও মধ্যে গরীবের অংশ রাখিয়াছে। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, وَاٰتُوا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ—ধান্য, পাট, আম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি যে কোন ফসল বা ফল গৃহে আন, প্রথমেই উহার মধ্য হইতে গরীবের হক বাহির করিয়া রাখ এবং তাহার পর তোমরা নিজ ব্যবহারে আন।

মোট কথা ইসলাম প্রত্যেক পদে পদে গরীবের হককে সম্মুখে রাখিয়াছে। ইহা ইসলামের এমন এক বৈশিষ্ট্য, যাহা অপর কোন মযহাবে নাই। দুনিয়ার কোন ধর্ম নাই যাহা এই এবাদতকে এইরূপ ব্যাপক আকারে পেশ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে ইহার শতাংশের একাংশ ব্যবস্থাও গরীবের জন্য নাই। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

২৭। নামায—শর্তাবলী ও আদব।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১৪৬) হযরত মুয়াবিয়া বিন্ হাকাম আস্‌সুলামী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একতেদায় (পিছনে) আমি নামায পড়িতে ছিলাম। নামাযীগণের মধ্যে এক ব্যাক্তি হাঁচিল। আমি ইহার প্রত্যুত্তরে 'ইয়ারহা মুকমুল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন' বলিলাম। অন্য নামাযী আমাকে তীক্ষ্ণ নজরে দেখিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম 'তোমাদের মা মরুক, তোমরা কেন আমাকে এভাবে দেখিতেছ?' ইহাতে লোকেরা তাহাদের উরুতে থাপড় দিতে লাগিল, যেমন মানুষ সঙ্কিত হইয়া করিয়া থাকে। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আসল কথা, এই সব লোক আমাকে চুপ করাইতে চায়। যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করিলেন, তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন। আমার মাতাপিতা তাঁহার (সাঃ) প্রতি ফিদা (উৎস্বর্গ) হউন। আমি ইতিপূর্বে বা তারপরও তাঁহার (সাঃ) চেয়ে অধিক ভাল ও দয়াদ্র শিক্ষক পাই নাই। খোদার কসম, তিনি (সাঃ) আমাকে তিরস্কারও করেন নাই, মারেন নাই, ভাল মন্দও বলেন নাই। বরং, নরমভাবে বলিলেন: এই যে নামায, ইহাতে কথা বলা ঠিক নয়। নামাযে তস্‌বীহ, তকবীর, কুরআন মজীদ পাঠ করা হয়।" বা তখন যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছিলেন। আমি নিবেদন করিলাম, "হুযুর, আমি নুতন মুসলমান হইয়াছি। এখনো অজ্ঞতার কাছাকাছিই রহিয়াছি। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে ইসলামের নেয়ামৎ দ্বারা অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমাদের কেহ কেহ 'কাহেন' (অদৃষ্ট-বক্তা) এবং জ্যোতিষীদের নিকট যায়।' তিনি ফরমাইলেন: 'তুমি উহাদের নিকট যাইবে না।' আমি নিবেদন করিলাম: আমাদের কেহ কেহ 'ফাল' দেখে, লগ্ন বাছে। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: এই সব কথা মনে নানা ধারণার সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই জন্য দ্বিধায় পড়িয়া কাজ হইতে নিবৃত্ত হইতে নাই।"

['মুসলিম,' 'কেতাবুস্-সালাত,' বাবু তাহরীমিল কালামে ফিস্ সালাতে,' ১-১ : ২০০ পৃঃ]

(১৪৭) হযরত ইব্‌নে উমর রাযি আল্লাহু আন্‌হুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "জামাতে নামায পড়া একাকী নামায পড়া অপেক্ষা সাতাইস গুণ উত্তম।"

['মুস্‌লিম,' কেতাবুস-সালাত, বাবু ফাজলে সালাতিল-জামায়াত ১-১ : ২৪৭ পৃঃ]

(১৪৮) হযরত আবু হুরায়রাহ্‌ রাযি আল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : 'যখন নামায দাঁড়াইয়া পড়ে। (জামাত নামায শুরু হইয়া যায়), তখন ফরয নামায ছাড়া অন্য কোনো নামায পড়া জায়েয নয়।'

['মুসলিম,' কেতাবুস-সালাত,' 'বাবু কেরহাতিশ্‌-শুরুয়ে ফিন্‌নাফেলাতি বা'দা শুরুয়িলমুয়ায্‌-যানে] ১-১ : ২৭৩ পৃঃ]

(১৪৯) হযরত আবু মাস্‌উদ আল্‌-আনসারী রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "লোকদের মধ্যে যে কুরআন করীম অধিক পাঠ করিয়াছে, সে নামাযে ইমাম হইবে। যদি সকলেই কুরআন করীম শিক্ষায় সমান সমান, তবে তাহাদের মধ্যে সুন্নতের জ্ঞান যাহার অধিক, সে নামায পড়াইবে যদি সকলেই ইহাতেও সমান হয়, তবে সেই ব্যক্তি ইমাম হইবে, যে প্রথমে হিজরত করিয়াছে। যদি তাহারা হিযরতেও সমান হয়, তবে তাহাদের মধ্যে যাহার বয়স বেশী, সে ইমাম হইবে। কোনো ব্যক্তি অন্যের ক্ষমতা গণ্ডির মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইমাম হওয়ার চেষ্টা করিবে না এবং কাহারো গৃহে তাহার অনুমতি ছাড়া এমন স্থানে বসিবে না, যাহা সে সম্মানের আসন হিসাবে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছে।"

['মুসলিম', কেতাবুস সালাত, বাবু মান আহাক্কু বিল্‌ ইমামাতে,' ১-১ : ২৫৭ পৃঃ]

(১৫০) হযরত আবু হুরায়রাহ্‌ রাযি আল্লাহ আন্‌হু বলেন যে তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইযে ওয়া সাল্লামকে ইহা বলিতে শুনিয়াছেন যে, "নামায দাঁড়াইলে তোমরা উহাতে দৌড়াইয়া শামিল হইবে না, বরং শান্তভাবে, গাম্ভির্যের সহিত যাইবে। নামাযের যে অংশ ইমামের সঙ্গে পাও, পড়িবে। যাহা রহিয়া যায়, তাহা পরে পুরা করিবে।"

['মুস্‌লিম', কেতাবুস সালাত, বাবু ইস্তেহ্‌বাবে ইতইয়ানিস সালাতা বেওকারি-ওঁ-ওয়াস্‌ সাকিনাতে', ১- : ২২৬ পৃঃ] (ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ
—এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার)

---

০ "প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় তোমরা তাকওয়ার সহিত নিশা যাপন করিয়াছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় তোমরা সততার সহিত দিন যাপন করিয়াছ।"

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"যাহাদের হৃদয় ঈমানের জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া যায়, ইসলাম প্রচারের কাজ কেবল সেই সকল লোকের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে।

কুরআন করীমে স্পষ্ট আদেশ আছে যে ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য তরবারী (জবরদস্তিমুলক ব্যবস্থা) গ্রহণ করিও না, বরং ধর্মের সাক্ষাৎ গুণাবলী তুলিয়া ধর।"

"আমি জানি না, আমার বিরুদ্ধবাদীগণ তরবারির জোরে ইস্‌লাম প্রসার লাভ করিয়াছে বলিয়া কোথায় শুনিল। পরন্তু খোদাতায়ালা কুরআন শরীফে বলিতেছেন : لا اكراه فى الدين "লা একরাহা ফিদ্দিনে"—অর্থাৎ "ইসলাম ধর্মে জবরদস্তি নাই।" তাহা হইলে জবরদস্তির আদেশ দিয়াছিল কে এবং জবরদস্তি করিবার কি উপকরণ ছিল? যে সকল লোককে জোর করিয়া মুসলমান করা হয় তাহাদের ধর্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠা কি কখনো এত প্রগাঢ় হইতে পারে যে, মাত্র দুই তিন শত লোক বিনা বেতনে সম্মুখ সমরে সহস্র সহস্র শত্রুর সম্মুখীন হয়? আবার যখন তাহারা সহস্রে পরিণত হয়, তখন লক্ষ লক্ষ লোককে সম্মুখ সমরে পরাভূত করে এবং শত্রুদের কবল হইতে ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য ছাগল ভেড়ার মত নিজেদের রক্ত দ্বারা শির উৎসর্গ করে ও নিজেদের রক্ত দ্বারা ইসলামের সত্যতার প্রামাণ লিখিয়া যায়? আল্লাহ্‌র একত্ব প্রচার করিবার জন্য কি তাহারা এইরূপ উদ্বুদ্ধ হয় যে দরবেশদের মত কঠোর ক্লেশ বরণ করিয়া আফ্রিকার মরুভূমিতে উপস্থিত হয় ও সেই দেশে ইসলাম প্রচার করে এবং সর্বপ্রকারের কষ্ট সহিয়া সুদূর চীনদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া ইসলামের আহ্বান শুনায়? যাহার ফল এইরূপ দাঁড়ায় যে তাঁহাদের কল্যাণময় প্রচার কার্যে সেই দেশে কোটি কোটি লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পুনঃ তাঁহারা কি চটপরিধানকারী দরবেশদের মত ভারতবর্ষে আগমন করে এবং আর্যাবর্ত্তেরও বহুলাংশকে ইসলাম দিয়া ধন্য করে এবং ইউরোপের সীমা পর্যন্ত "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর ধ্বনী পৌঁছাইয়া দেয়? এখন আপনারা ধর্মতঃ বলুন, যাহাদিগকে জোর করিয়া

মুসলমান করা হইয়া থাকে এবং যাহারা অন্তরে বিধর্ম ও বহুতঃ মুসলমান তাহাদের দ্বারা কি এইরূপ কাজ সাধিত হইতে পারে? বরং যাহাদের হৃদয় ঈমানের জ্যোঃতিতে পুর্ণ হইয়া যায় এবং হৃদয়ের মধ্যে খোদা বই আর কিছুই থাকে না, তাহাদের দ্বারাই এই রকম কাজ সাধিত হইতে পারে।" (পয়গামে সুলাহ)

"কুরআন করীমে স্পষ্ট আদেশ আছে যে, ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য তরবারী (জবরদস্তিমুলক ব্যবস্থা) ধারণ করিও না বরং ধর্মের সাক্ষাৎ গুণাবলী মানুষের নিকট তুলিয়া ধর এবং নেক নমুনা ও উত্তম দৃষ্টান্ত দ্বারা মানুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট কর। ইহা মনে করিও না যে, ইসলামে প্রাথমিককালে তলোয়ার চালাইবার আদেশ হইয়াছিল। কেননা ধর্ম সম্প্রারণের উদ্দেশ্যে তলোয়ার চালানো হয় নাই, বরং শত্রুদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যেই চালাইতে হইয়াছিল। ধর্মের জন্য শক্তি প্রয়োগ ও জবরদস্তি করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না।" ("সেতারায়ে কায়সারিয়া", পৃঃ ১৬)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

'খোদাতায়ালা আমাকে বরংবার সংবাদ দিয়াছেন যে তিনি আমাকে বহু সম্মান দান করিবেন এবং লোকাদগের অন্তরে আমার প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি করিবেন। তিনি আমার অনুসরণকারী সঙ্ঘকে সারা জগতে বিস্তৃত করিবেন এবং তাহাদিগকে সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করিবেন। আমার অনুসরণকারীগণ এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করিবে যে, সত্যবাদীতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে তাহারা সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। সকল জাতি এই মন্দাকিনী ধারা হইতে তৃষ্ণা নিবারণ করিবে এবং আমার সঙ্ঘ ফলফুল সুশোভিত হইয়া দ্রুত বর্ধমান হইবে এবং অচিরে সারা জগৎ ছাইয়া ফেলিবে। বহু বিঘ্ন দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসিবে, কিন্তু খোদা সেগুলিকে পথ হইতে অপসারিত করিয়া দিবেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেন।" (তাযাল্লিয়াতে এলাহিয়া)।

"আমি তোমার নাম ও প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব।"—(তাযকের)।

—হযরত ঈমাম মাহদী (আঃ)

জামাত আহমদীয়ার ৮৫ তম কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সালানা জলসা রাবওয়ায় অসাধারণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

দেড় লক্ষ লোকের সমাগম, পঞ্চাশ হাজার মহিলার সমাবেশ
৩১টি দেশ হইতে আহমদীগণের যোগদান

বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ইসলামী বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত ও অনুপম দৃশ্যাবলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জলসার দ্বিতীয় দিবস ঃ

"খোদায়ী ওয়াদসমূহের ফলশ্রুতিতে জগতের প্রত্যেক অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে ইসলামের সপক্ষে এক মহান বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করিতেছে।"

"প্রারম্ভে নও-মুসলিমদিগের সংখ্যা মূখ্য বিষয় নয়, বরং তাহাদের নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গ এবং উপযুক্ততার প্রাচুর্যই গুরুত্ববহ।"

হযরত খালিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর দ্বিতীয় দিবসের ভাষণ :

রাবওয়া, ২৭শে ডিসেম্বর (মঙ্গলবার)—আজ জামাত আহমদীয়ার ৮৫ তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিন ছিল। আজকের দ্বিতীয় অধিবেশনে, যাহা যোহর ও আসরের বাজামাত নামাযান্তে ২ ঘটিকায় আরম্ভ হয়। সৈয়দনা হযরত খালিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) কেবল পাকিস্তানের সকল অঞ্চল হইতেই নয় বরং পৃথিবীর ৩১টি দেশ হইতে আগত প্রায় দেড় লক্ষ মুখলেস ও আত্মোৎসর্গীত ব্যক্তিদের মহান সমাবেশকে, যাহা এক উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায় দূর দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, পুরুষ ও মহিলাদের দুইটি পৃথক পৃথক জলসাগাহে সন্নিবিষ্ট ছিল, একটি অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক ও সারগর্ভ ভাষণের দ্বারা অভিষিক্ত করেন। উক্ত পবিত্র ভাষণে হুজুর (আইঃ) আল্লাহ্‌- তায়ালার 'হুসন্‌ ও ইহ্‌সান'—তাঁহার সৌন্দর্য ও কল্যাণের অতীব সুন্দর ও আকর্ষণীয় জ্যোতির্বিকাশ সমূহ এবং তাঁহার অসাধারণ ফজল ও অনুগ্রহরাজী উল্লেখ করিবার পর বিশেষভাবে ইহা বর্ণনা করেন যে, খোদায়ী ওয়াদা অনুযায়ী পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে ধারাবাহিকভাবে ইসলামের সপক্ষে এক মহান বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

হুজুর পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা এবং দেশে প্রকাশমান এই মহান বিপ্লবের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করিয়া বলেন যে, যদিও আফ্রিকায় বিপুল সংখ্যক মানুষ জামাত আহমদিয়ার কর্ম প্রচেষ্টার ফলে ইসলামে দাখিল হইয়াছে, তথাপি ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলামে দীক্ষাগ্রহণকারীদের সংখ্যা এখনও বেশী নয়। হুজুর এই প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রথমিক পর্যায়ে নও-মুসলিমদিগের সংখ্যা নয় বরং এখলাস, নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের আধিক্য ও প্রাচুর্যই গুরুত্ব বহণ করে। আল্লাহ্‌তায়ালা প্রথমে মুখলেস ও নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিবর্গকে হক ও সত্য কবুল করার সৌভাগ্য দান করিয়া থাকেন, যাঁহারা নিজ নিজ জাতির জন্য খেদমত ও আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া দেখান, এবং এই-ভাবে সত্যের বিজয় ও প্রাধান্য বিস্তারের পথ সমতল ও সুগম করার কারণ হন সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার এই চিরাচরিত সুন্নত ও নিয়ম অনুযায়ী ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে জামাত আহমদীয়াকে এরূপ দুষ্প্রাপ্য মনিমানিক্য দান করিয়াছেন, যাঁহারা নিজেদের জীবন ইসলামের সেবায় উৎসর্গীত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং তাঁহারা এমন কৃতিত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন যাহা ভবিষ্যতে সেখানে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারকে বাস্তবে রূপায়নে, ইনশাআল্লাহুল-আযীয, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে। হুজুর বলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে এত বিপুলভাবে তাঁহার ফজল ও ইহ্‌সানে ভূষিত করিতেছেন যে আমরা সেগুলি গণনা করিতে অক্ষম এবং আমরা যদি আমাদের সারা জীবন আল্লাহ্‌তায়লার শোকর আদায়ে অতিবাহিত করি, তবুও শুধু তাঁহার একটি ফজল ও অনুগ্রহের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের হক আদায় করিতে সক্ষম হইব না। হুজুর (আই:) আহ্‌বাবকে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও রহমতরাজীর ধারাবাহিক ও ক্রমাগত অবতরণ স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের জিম্মাদারী সমূহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং এই বিষয়টি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করান যে, ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের পথে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু ক্রমাগত ও অব্যাহত কুরবানীর বদৌলত খোদা-তায়ালার ফজলে সেই সকল বাধা-বিপত্তি দূরীভূত হইতে থাকিবে এবং ইসলাম পৃথিবীতে ক্রমশ: আগাইয়া যাইতে থাকিবে। কখনও এমন কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইবে না, যাহা আমাদিগকে একই স্থানে খাড়া থাকিতে বাধ্য করিতে পারে।

সকাল বেলার অধিবেশন :

আজ সকালবেলার অধিবেশনে, যাহা অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী মহতারম মির্যা আব্দুল হক সাহেব (এডভোকেট), আমীর জামাত আহমদীয়া, পাঞ্জাব-এর সভাপতিত্বে সোয়া নয় ঘটিকায় আরম্ভ হয়, কুরআন করীম তেলওত ও নযম পাঠের পর মহতারম মৌলানা

দোস্ত মোহাম্মদ সাহেব শাহেদ "খাতামান্নবীয়ানের ব্যাখ্যা এবং পূর্ববর্ত্তী বুজুর্গানে-উম্মত" বিষয়ে, মোহতারম মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব, নায়েব এসলাহ ও ইরশাদ "আমি দ্বীনকে দুনিয়ার উপর শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিব" বিষয়ে এবং মহতারম মৌলানা বেশারত আহমদ সাহেব বশীর, নায়েব ওকীলুত তবশীর "মুসলিম নারীর মর্যাদা এবং সতীত্ব ও শালীনতা" বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত, বহির্দেশ সমূহের জামাতী প্রতিনিধিদল সমূহের আমীর সাহেবানের মধ্য হইতে জার্মান প্রতিনিধি-দলের আমীর জনাব হেদায়েতুল্লাহ হাব্‌শ, ডেনমার্কের জনাব আব্দুস সালাম মেডসন এবং ট্রিনিডাডের জনাব ইসফাহানী সাহেব ইংরাজী ভাষায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করিয়া নিজ নিজ জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের পক্ষ হইতে জলসায় উপস্থিত সুধীবৃন্দকে সালাম পৌঁছাইয়া তাঁহাদের জামাতের উন্নতি এবং সেখানে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্য দোওয়ার আবেদন করেন। আমাদের জার্মান নও-মুস্লিম আহমদী ভ্রাতা জনাব হেদায়েতুল্লাহ হাব্‌শ একজন সুবক্তা এবং উচ্চপর্যায়ের কবিও বটে, তিনি ইংরেজী ভাষায় স্বরচিত একটি দ্বীনি কবিতাও পাঠ করিয়া শোনান।

সকালের অধিবেশন বারটায় সময় সমাপ্ত হয়। বারটা হইতে দেড়টা পর্যন্ত নামাযের প্রস্তুতির জন্য বিরতি ছিল। সুতরাং আহ্‌বাব এই বিরতির মধ্যে ওজু ইত্যাদি সম্পন্ন করিয়া দেড় ঘটিকার বহু পূর্বেই পুনরায় জলসাগাহে আসিয়া সমবেত হইলেন, যাহাতে হুজুর (আইঃ)-এর ইক্‌তেদাতে (পিছনে) নামায আদায় করিতে পারেন। তাঁহারা সাঁড়িবদ্ধভাবে বসিতে লাগিলেন। সুতরাং জলসাগাহ ভরিয়া গেলে উহার বাহিরেও দূর দূর পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি ও প্রেম উদ্বেলিত নামাযীগণের সাঁড়ি সমূহ প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

ঠিক দেড় ঘটিকায় হুজুর (আইঃ) জলসাগাহের মঞ্চে আরোহণ করিয়া যোহর ও আসরের নামায জমা করিয়া পড়ান। নামায আদায়ের পর হুজুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন, এবং জলসায় উপস্থিত বৃন্দ সকলকে উচ্চৈঃস্বরে 'আস্-সালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহে ওবারকাতুহু' বলেন। প্রত্যুত্তরে সমগ্র জলসাগাহ প্রায় দেড়লক্ষ লোকের 'ওয়ালাইকুম সালাম ...' এর ভক্তি ও আবেগপূর্ণ ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হইয়া উঠে। অতঃপর হুজুর আজকের দ্বিতীয় অধিবেশনের কর্মসূচী আরম্ভ করার পূর্বে জলসাগাহের বাহিরে যাহারা নামায পড়িতেছিলেন তাঁহাদের ভিতরে আসার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন।

HOME LIBRARY
339 PIRERBUG
MIRPUR
DHAKA—1210
ZILLUR RAHMAN KHAN

দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্যক্রমের সূচনা ঃ

হুজুরের নির্দেশক্রমে ঠিক দুই ঘটিকায় দ্বিতীয় অধিবেশন তেলাওত কুরআন করীমের দ্বারা আরম্ভ হইল। তেলাওত করিলেন মোহতারম সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব, নাযেম ইরশাদ, ওক্‌ফে জদীদ। অতঃপর সপ্তাহিক 'লাহোর' পত্রিকার সম্পাদক জনাব সাকেব যিরভী সাহেব 'আঞ্জাম বা পরিণাম' শিরোনামে স্বরচিত কবিতা অতীব আর্ষণীয় সুললীত কণ্ঠে পাঠ করিয়া শোনান। ইহার ছন্দে ছন্দে আহ্‌বাব আত্মবিভোর হইয়া পড়েন এবং মুহুর্মুহু তকবীরের না'রা তুলিয়া প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর হুজুর ১৯৭৭ সালে কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে আনসারুল্লাহ ও খুদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম স্থান অধিকারী মজলিসদ্বয়কে 'এনয়ামী পতাকা' প্রদান করেন।

হুজুর (আইঃ)-এর ঈমানবর্ধক ভাষণ :

অতঃপর হুজুর আহ্‌বাবে জামাতকে দুই ঘণ্টা ব্যাপী স্থায়ী এক ঈমান-বর্ধক ভষণের দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন। এই ভাষণে হুজুর নেযারত এশায়াতে লিটারেচার ও প্রণয়ন, তাহরীক জদীদ, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ওক্‌ফে জদীদ, ইসলাহ্‌ ও ইরশাদ (তালিমুল কুরআন), ওক্‌ফ আরজী, ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন, নুসরত জানান স্কীম এবং শতবর্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনার অধীনে ১৯৭৭ সালে সম্পাদিত কার্ম-তৎপরতার এবং উহাদের আনন্দপ্রদ সুফলের উপর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে আলোকপাত করিয়া বিশেষতঃ বহির্দেশে নুতন মিশন (প্রচারকেন্দ্র), নুতন মসজিদ ও নুতন জামাত সমূহ প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহ্‌তায়ালার বারিধারার ন্যায় বর্ষিয়মান ফজল ও মহাকৃপা সমূহ বর্ণনা করিয়া আহ্‌বাবকে তাহাদের মহান জিম্মাদারী সমূহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তাহরীকে জদীদের অধীনে পূর্বীয় ও পশ্চিমী দেশগুলিতে যে মহান বিপ্লব উদীয়মান, উহার উল্লেখ পূর্বক হুজুর কোনিয়া ও কেনাডার নুতন মিশন ও বিভিন্ন দেশে নুতন জামাত সমূহ প্রতিষ্ঠা এবং চারিটি নুতন মসজিদ তামিরের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, সংখ্যার দিক দিয়াও এবং এখলাস ও আন্তরিকতা এহং আত্মোৎসর্গের দিক দিয়াও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের দৃষ্টি-কোন হইতে এক বিপ্লব উদিত হইতেছে। এমনি ধারায় ইউরোপ ও আমেরিকায়ও এবং আফ্রিকার বিশাল ও সুবিস্তৃত

মহাদেশেও ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং আল্লাহতায়ালার ফজলে ইসলামের কদম সর্বত্রই আগাইয়া চলিয়াছে। সংখ্যার দিক দিয়া বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তনের বিষয়টি এতদ্বারাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, পশ্চিম আফ্রিকার দুইটি দেশ ঘানা এবং সিয়েরালিওনে, স্বয়ং সেখানকার লোকের অনুমান অনুযায়ী আহ্‌মদী গণের সংখ্যা দশ লক্ষ ছাড়াইয়া গিয়াছে, এবং তাঁহারা সকলই মুখলেস ও আত্মোৎসর্গীত এবং ইসলামের জন্য বিপুল কুরবানী দানকারী।

এই প্রসঙ্গে ইউরোপে উদীয়মান আধ্যাত্মিক বিপ্লব সম্পর্কে উল্লেখ পূর্বক হুজুর আকদাস বলেন যে, সেখানে যদিও ইসলামে দীক্ষা গ্রহণকারীগণের সংখ্যা খুব বেশী নয়, তথাপি যাঁহারা ইসলাম কবুল করিয়াছেন, তাঁহারা এখলাস ও ওফাদারী, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্ত্তী স্বরূপ এবং নিজেদের যাবতীয় যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে তাঁহারা ইসলামের খেদমত ও সেবায় নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন। যখন বহির্দেশে মানুষ ইহা বলে যে, ইউরোপে এখনও ইসলাম সংখ্যার দিক দিয়া তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই, তখন আমি তাহাদিগকে বলিয়া আসিয়াছি যে, এখন তো সুচনা মাত্র এখনও মাথা গণনার সময় আসে নাই। বরং আপনারা দেখুন যে, কি প্রকারের পরিবর্ত্তন সাধিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্বারা খোদাতায়ালার শান দৃশ্যমান হয় এই সকল নও-মুসলিম আহ্‌মদীর মধ্যে এমন সুযোগ্য ব্যক্তিও আছেন, যিনি আরবী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া ডেনিশ ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা করিয়াছেন। তারপর, উহাকে একটি কম্পানী প্রকাশ করিয়াছে এবং সেই তরজমা অত্যন্ত সমাদ্রিত হইয়াছে। ইহা সামান্য কথা নয়, বরং এতদ্বারা এক আনন্দপ্রদ বিপ্লব চিহ্নিত হইতেছে। তেমনিভাবে ইটালীবাসী আমাদের নও-মুসলিম আহ্‌মদী ভ্রাতা জনাব ডাঃ আব্দুল হাদী কিউসী মরহুমের জীবনে ইসলাম গ্রহণের পর এমন পরিবর্ত্তন প্রস্ফুটিত হয় যে তিনি আত্মত্যাগের মনোবলে বলিয়ান হইয়া দিবারাত্র কাজ করিয়া কুরআন মজীদের ইস্প্রান্টো ভাষায় তরজমা করেন। সেই তরজমাও ইউরোপের একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করে এবং উহা ও অত্যন্ত বরণীয়তা লাভ করিয়াছে। ইউরোপের ভূমিতে এরূপ মুখলেস আত্মোসর্গী ও সুযোগ্য ব্যাক্তিগণের ইসলামের আওতাভূক্ত হওয়া আল্লাহতায়ালার অনন্য সাধারণ 'তাইদ ও নুসরত,' সাহায্য ও সমর্থনের জ্বলন্ত প্রমাণ। এরূপ এক ব্যক্তিও বড় বড় দলের উপর প্রবল হইয়া থাকে। মোটকথা, এক মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লব, যাহা ক্রমান্বয়ে প্রকাশমান হইয়া চলিয়াছে।

আল্লাহ্‌তায়ালার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ঃ

হুজুর (আইঃ) জলসার দ্বিতীয় দিনে তাঁহার উক্ত ভাষণ আল্লাহ্‌তায়ালার ইহ্‌সান ও অনুগ্রহরাজীর বর্ণনা দানের সহিত আরম্ভ করেন এবং এই প্রসংঙ্গে তিনি খোদাতায়ালার শুকরিয়া আদায়স্বরূপ তাঁহার একটি ইহ্‌সান ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন :

আমাদের খোদা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। তিনি তাহাদিগকে অগণিত ও অপরিসীম ইহ্‌সান ও কল্যাণে ভূষিত করিয়া থাকেন। আমি কোন্ মুখ দিয়া আল্লাহতায়ালার কোন্ কোন্‌টি ইহসানের কথা উল্লেখ করিব, এবং সেই ভাষা কোথায় পাইব, যদ্বারা তাঁহার গণনাতীত ইহসান ও কল্যাণের শোকরীয়ার হক আদায় করা যায়। আমাদের ন্যায় আজেয ও অক্ষম মানুষের দ্বারা তো তাহা কখনও সম্ভব নয়। তাঁহার একটি আযিমুশ্‌-শান ইহ্‌সানের কথা এখন আমি উল্লেখ করিতে চাই। গতকাল (২৬শে ডিসেম্বরের) সন্ধ্যার রিপোর্ট হইল এই যে, বিগত বৎসর উক্ত তারিখে যতজন মেহ্‌মান রাবওয়ায় আগমন করিয়াছিলেন তাহার মোকাবিলায় এ বৎসর বিশ হাজারেরও বেশী বহিরাগত আহ্‌বাব রবওয়ায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং এখনও মেহ্‌মান-গণের আগমনের ধারা অব্যাহত রহিয়াছে। অধিকন্তু, সামগ্রিকভাবে ৩১টি বহির্দেশ হইতে আহ্‌মদীগণ জলসায় যোগদানের জন্য আসিয়াছেন। সুতরাং অন্য কথায়, এই মুহূর্তে জলসাগাহে পাকিস্তান ছাড়া ৩১টি দেশের আহমদীগণ উপস্থিত আছেন। আল-হামদোলিল্লাহ, সুম্মা আল-হামদো লিল্লাহ। আমরা আল্লাহতায়ালার উপর তাওয়াক্কল ও ভরসা করিয়া এই আশা রাখি যে, আগামী বৎসরগুলিতে জলসায় যোগদানকারী দেশগুলির সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে এবং ইনশাআল্লহুল আযীয, খোদায়ী ওয়াদা সমূহের ফলশ্রুতিতে সেই দিনও আসিবে, যখন প্রত্যেক দেশের আহমদীগণ সালানা জলসায় ক্রমাগত যোগদান করিতে থাকিবেন।

সেলসেলার নব্য প্রকাশিত পুস্তকাদি ক্রয়ের আহ্বান ও গবেষণা ও পুস্তক-রচনার ক্ষেত্রে এক অভিনব মূলনীতির ব্যাখ্যা ঃ

অতঃপর হুজুর (আইঃ) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ ও বিভিন্ন দেশের জামাতসমূহের পক্ষ হইতে ১৯৭৭ ইং সালে প্রকাশিত পুস্তকাবলী ক্রয়ের জন্য আহ্বান করার পূর্বে জামাতের লিখক বর্গকে নুতন পুস্তকাদি রচনা ও প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি বুনিয়াদী বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুতরাং হুজুর বলেন :

নূতন পুস্তকাদি ও তরজমাসমূহের উল্লেখের পূর্বে পাঠকবর্গ ও পুস্তক প্রণয়নকারী-দিগের দৃষ্টি একটি নীতিমূলক বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করিতে চাই, এবং তাহা হইল এই যে, কুরআন মজিদে আমাদিগকে এই দোওয়া শিখান হইয়াছে : رب زدنی علما

অর্থাৎ, 'হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর'। এই দোওয়া ব্যক্তির জন্যও, জামাতের জন্যও, জাতিসমূহের জন্যও এবং মানবমণ্ডলীর জন্যও। এই দোওয়া ব্যক্তিগতভাবে এবং ব্যষ্টি ও জামাতগতভাবেও চাওয়া একান্ত জরুরী। ইহার কারণ এই যে, এল্‌ম বা জ্ঞানের কোন শেষ নাই। ইহা তো এক কিনারাহীন অপরিসীম সমুদ্র। ইহার হেতু ও কারণ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এই বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেহেতু আল্লাহতায়ালার সেফাত বা গুণাবলী অপরিসীম ও অনন্ত, সেইহেতু পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিষের উপর আল্লাহতায়ালার অপরিসীম গুণাবলীর অপরিসীম প্রভাব পড়িতেছে এবং ইহার ফলশ্রুতিতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি বস্তুতে নিত্যনূতন বৈশিষ্ট্য বা গুণের সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে। সেজন্য এমন কোনও পর্যায় বা স্তর আসিতে পারে না যখন মানুষ ইহা বলিতে পারে যে সে কোন জিনিষের যাবতীয় গুণ বা বৈশিষ্ট পরিজ্ঞাত হইয়াছে এবং সেগুলি আয়ত্ত করিয়াছে। সুতরাং মানুষ যত জ্ঞানই লাভ করুক না কেন, তাহার জ্ঞান সীমিত ও অপূর্ণ থাকিবে, এবং তাহার জন্য জরুরী, সে যেন অধিকতর জ্ঞানার্জনে চেষ্টিত ও ব্যপৃত থাকে।

সেজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, আল্লাহতায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে رب زدنی علما—কুরআনী দোওয়ার অনুসরণে ও ব্যাখ্যারূপে আর একটি দোওয়া শিক্ষা দিয়াছেন। তাহা হইল : رب ارنی حقائق الاشیاء অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাকে বস্তু নিচয়ের বাস্তব গুণ, তত্ত্ব ও তথ্যাদি দেখাও বা প্রত্যক্ষ করাও।" যেহেতু বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত গুণ ও তত্ত্ব অসীম ও অনন্ত, সেইহেতু জ্ঞান আহরণ এবং বস্তুগত বাস্তব সত্য, তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ধার ও উদঘাটন কখনও শেষ হইতে পারে না। অনেক সময় মানুষ মনে করে, সে একটি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছে কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পরই জানা যায়, সে বিদ্যা-বুদ্ধি খাটাইয়া যে কথার সন্ধান পাইয়াছিল, তাহা ভুল ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এজন্য যে, উহা আসল তত্ত্ব ও তথ্যের পরিপন্থি। প্রকৃতপক্ষে সে আসল তত্ত্ব ও তথ্যকে পাশ কাটাইয়া যত বেশী জ্ঞান আহরণ করে, তত বেশী তাহার পূর্বের ভুলসমূহ প্রকাশমান হইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়, এমনকি ইহা বলা দুষ্কর যে, মানুষ উদ্‌ঘাটন ও আবিষ্কার সমূহ অধিকতর করিতেছে, না, তাহার নিকট তাহার ভুলসমূহ অধিকতর প্রকাশ পাইতেছে। এজন্যই আল্লাহতায়ালা এই শিক্ষা দিয়াছেন যে আমরা যেন জ্ঞান বৃদ্ধ এবং বস্তু নিচয়ে অন্তর্নিহিত প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার জন্য আল্লাহতায়ালার সমীপে দোওয়া করিতে থাকি।

দুনিয়াতে সাধারণত :' দেখা যায় যে, মানুষ জ্ঞান অন্বেষণ তো করে কিন্তু হকায়েক তথা বাস্তব ও প্রকৃত তত্ব ও তথ্যকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না। ইহাতে ফল এই দাঁড়ায় যে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পর তাহাদের জ্ঞান অজ্ঞানতা হিসাবেই বলিয়া হয়। হাকায়েক বা আসল সত্য ও বাস্তব তত্ব ও তথ্যকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া গবেষণার ভ্রান্ত পদ্ধতির প্রচলনের কারণ হয় এবং উক্ত ভ্রান্ত পদ্ধতিটি ইসলামের বিরুদ্ধে কুসংস্কার ও বিদ্বেষ পরায়ণ স্কলার ও পণ্ডিতগণই রওয়াজ দিয়াছেন। এমন হয় যে কোন বিষয়ে যদি একশত জনে পৃথক পৃথকভাবে পুস্তক রচনা করিয়া থাকে, তবে আর এক ব্যক্তি উঠিয়া কোন কথা একটি পুস্তক হইতে এবং কোন কথা অন্য পুস্তক হইতে লইয়া বিভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত কথা বা দৃষ্টিভঙ্গি একত্র করিয়া একটি নুতন পুস্তক লিখিয়া পেশ করে। ইহা গবেষণা তো বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে 'হাকায়েক' থাকে না হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এলহাম رب ارنی حقائق الاشیاء ("রাব্বে আরেনি হাকায়েকাল আশইয়া") নির্দেশ করে যে, মানুষের উচিত হাকায়েকের দিকে যেন মনোনিবেশ করে অন্যদের বাস্তব বিরোধী কথার দিকে ধ্যান না দেয় এবং সেগুলির উপর নির্ভর না করে; আর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোওয়া করিতে থাকে যে, হে খোদা, আমাদের জ্ঞানই শুধু বৃদ্ধি-করিও না বরং হাকায়েক সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহীত কর।

আহমদীদের উচিত, তাঁহারা যেন প্রচলিত গবেষণার উক্ত পটভূমিকা সামনে রাখিয়া হাকায়েক সম্বলিত পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন। সঠিক ও সহি ধারায় গবেষণা চালাইবার এবং আসল ও বাস্তব তত্ব ও তথ্যের গুরুত্বকে জগত কর্তৃক স্বীকার করাইবার ব্যাপারে আমাদিগকেই প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে, জগতকে গবেষণার আসল পদ্ধতির দিকে আমাদিগকেই আনিতে হইবে। এজন্য আমি আহ্মদী লিখকবৃন্দের মনোযোগ এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি যে, তাঁহারা মানবতাকে বিপদাবলী হইতে রক্ষা করার জন্য এই ময়দানেও অগ্রসর হউন, এবং পথ-নির্দেশের কর্ত্তব্য পালন করুন। আমামাদের পুস্তক প্রণেতাগণের পুস্তকাদি সংখ্যায় ততটা নয় যতটা হওয়া উচিত। আমাদের কাছে খোদা-তায়ালার ফজলে উচ্চ পর্যায়ের মেধা-মস্তিষ্ক-সম্পন্ন ব্যক্তিরা তো আছেন, কিন্তু নুতন নুতন গ্রন্থাদি প্রণয়নের দিকে তাঁহারা ততটা মনোযোগ দিতেছেন না, যতটা দেওয়া দরকার। কতক পুস্তকই সম্বন্ধে আমাকে বলা হইয়াছে যে, আমি আহ্বাবকে সেগুলি হইতে ফায়দা হাসেল করার আহ্বান করি। (অতঃপর সেগুলি ক্রয় করার জন্য হুজুর তাহ্রীক করেন।)

হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর সমাপ্তি ভাষণ

"মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পুর্ণতাদানের জন্য জরুরী যে, আমরা আল্লাহতায়ালার চারিটি বুনিয়াদী সেফাতের রঙে নিজদিগকে রঙীন করি।"

"বর্তমানে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্থ জগৎ এমন এক জামাতের মুখাপেক্ষী, যাহা 'মুহসেনেইনসানিয়াত' —মানবের শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী রসুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ আঃ)-এর উসওয়া ও আদর্শে পরিচালিত হইয়া জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে।"

জলসার তৃতীয় দিন ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ ইং হযরত খলিফাতুল মসীহ (আইঃ) দেড় ঘটিকায় জলসাগাহে আগমনপূর্বক নামায জোহর ও আসর বাজামাত আদায়ের পর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, দেড় লক্ষের বিশাল জনতা আল্লাহু আকবর, ইসলাম যিন্দাবাদ, ইনসানিয়াত যিন্দাবাদ, মুহসেনে ইনসানিয়াত (সাঃ আঃ) যিন্দাবাদ, পাকিস্তান যিন্দাবাদ, আহ্‌মদীয়াত যিন্দাবাদ এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ) যিন্দাবাদ প্রাণবন্ত ও গগনবিদারী না'রা সমুহের দ্বারা ধূসর পাহাড়ে ঘেরা রাবওয়ার আকাশ-বাতাস গুঞ্জরিত করিয়া তোলে। ঘানা হইতে আগত একজন আফ্রিকান আহমদী ভ্রাতা বিশেষভাবে বিপুল আবেগের সহিত উচ্চৈস্বরে উক্ত ইসলামী না'রাসমুহ উত্তোলন করেন এবং যখন তিনি অন্যান্য না'রার সহিত ঘানা যিন্দাবাদ-এর না'রা লাগান, তখন সকল উপস্থিতবৃন্দ উহাতেও তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলান।

বিকাল দুই ঘটিকায় জলসার সমাপনি অধিবেশন কারী হাফেজ মোহাম্মদ আশেক সাহেব কর্তৃক কুরআন পাকের তেলাওতের সহিত আরম্ভ হয়। অতঃপর হুজুর (আইঃ) এর নির্দেশাধীন আল-হাজ্ব চৌঃ শব্বীর আহমদ সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আঃ -এর ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় পাক ও পূত পদ্য রচনাবলী হইতে নির্বাচিত অংশবিশেষ সুললিত কণ্ঠে পড়িয়া শোনান। অতঃপর সাপ্তাহিক "লাহোর" পত্রিকার সম্পাদক জনাব সাকেব জিরভী সাহেব স্বরচিত একখানা না'তে-রসুল সাঃ) সুললিত কণ্ঠে পাঠ করেন। উক্ত দুইটি কবিতা পাঠের পর ২-৩৫ মিনিটে সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) তাঁহার অতীব হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ ইল্‌মী ভাষণ আরম্ভ করেন। হুজুর বলেন :

প্রত্যেক বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট এই প্রশ্ন সব চাইতে বুনিয়াদী গুরুত্ব বহণ করে যে, এই বিশাল সমগ্র জগৎ তৈরী করার এবং মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি। যদি আমরা আজিকার সভ্য জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে,

আমাদের ইহাই বোধগম্য হয় যে, এই দুনিয়ার দিক বিভ্রম ঘটিয়াছে এবং সঠিক দিকে তাহার গতিপথ বিস্মৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের উদ্দেশ্য মানুষ নিজে জানিতে পারে না, যতক্ষণ না স্বয়ং তাহার সৃজনকারী খোদাতায়ালা তাহাকে উহা জানাইয়া দেন যে, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি। হুজুর বলেন, এতদোদ্দেশ্যে যখন আমরা আল্লাহতায়ালার আখেরী ও পূর্ণতম কালাম কুরআনপাকের দিকে মনোনিবেশ করি, তখন আমরা ইহার সন্ধান পাই যে, উক্ত বিষয়ে ইহা আমাদের পূর্ণ পথ-প্রদর্শন করিয়াছে, এবং বলিয়াছে যে, وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون —অর্থাৎ, আল্লাহতায়ালার এবাদত করা, তাঁহার বান্দা ও দাসে পরিণত হওয়া এবং তাঁহার সহিত জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপন করাই মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। যখন আমরা মানব প্রকৃতির বিচার বিশ্লেষণ করি, তখন স্বতঃই ইহা উপলব্ধি করি যে, বাস্তবিকপক্ষে তাহার স্বভাব ও প্রকৃতিতে আল্লাহতায়ালার অন্বেষা এবং তাঁহার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের স্বভাবজ স্পৃহা ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-ও এ বিষয়টি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, যে, কুরআন করীম অনুযায়ী মানুষকে এজন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, সে যেন খোদাতায়ালার আরাধনা করে, তাঁহার মা'রেফত (জ্ঞানতত্ব) লাভ করে এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিজেকে ওক্‌ফ বা আত্মনিবেদিত করে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে সেই সকল সিফাত বা গুণ কি, যাহা মানুষকে আল্লাহ-তায়ালার 'আব্‌দ' বা দাসে পরিণত করে। সুতরাং এ বিষয়ে যখন আমরা চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধান করি, তখন আমরা জানিতে পারি যে, সূরা ফাতেহায় বর্ণিত আল্লাহতায়ালার চারিটি বুনিয়াদী সিফাত (উম্মুহাতুস্ সিফাত) এইরূপ যে, মানুষের উচিত, নিজেকে সেই সকল সিফাতের বিকাশস্থল রূপে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা-সাধনা করা, যাহাতে সে খোদা-তায়ালার 'আব্‌দ' বলিয়া আখ্যায়িত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে।

হুজুর (আইঃ) বিস্তারিতভাবে আল্লাহতায়ালার বুনিয়াদী চারি সেফাতা—'রব, রহমান, রহিম ও মালেকে ইওমিদ্দীন'-এর বৈশিষ্টাবলী এবং উহাদের কার্যকারিতার পরিমণ্ডলীর উপর সূক্ষ্মতত্ব সম্পন্ন আলোকপাত করেন এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীরূপে ইহা সাব্যস্ত করেন যে, উক্ত চারি সেফাতের মধ্যে এক পূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক, ঐক্যবদ্ধ সংযোগ এবং সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয় এবং পরিশেষে রুবুবিয়তের মধ্যে উহাদের সম্মিলন ঘটে। হুজুর বলেন যে, আল্লাহতায়ালার উক্ত সেফাতের রঙে নিজেদেরকে রঙীন করার জন্য যে সকল শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োজন, তাহা সব কিছুই আল্লাহতায়ালা মানুষকে দান করিয়াছেন, এবং এই ক্ষেত্রে তিনি তাহাকে এখতেয়ার ও ক্ষমতার অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাহার সকল প্রকারের দুর্বলতা সত্ত্বেও সর্বক্ষণ তৌবার দুয়ার খোলা রাখিয়াছেন এবং কাহাকেও এই হক বা অধিকার দেন নাই যে, কেহ রুহানী ব্যাধির ইস্‌লাহ ও নিরাময় প্রচেষ্টার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারে।

অতঃপর উক্ত সেফাত (মানবীয় ক্ষমতা ও গণ্ডীর মধ্যে) আহরণ ও আয়ত্বের ব্যাপারে মানুষকে কুরআন করীম যে সকল নীতিগত ও বুনিয়াদী হেদায়ত ও পথ-নির্দেশ দান করিয়াছে, উহাদের কয়েকটির উপর আলোকপাত করিয়া হুজুর কুরআন করীম অনুযায়ী 'খাইরে-উম্মত' (সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতে)-এর ব্যক্তি হিসাবে একজন মুসলমানের উপর কি কি দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করেন। হুজুর বলেন যে, ইসলাম সকল সৃষ্টিজীবের হক বা অধিকার কায়েম করিয়াছে। প্রত্যেকের স্বভাবজ ক্ষমতা ও শক্তি নিচয়ের পূর্ণ পরিপোষণ ও বিকাশের উপকরণ ও সামান প্রদান করিয়াছে এবং প্রত্যেক মুমেনের নিকট এই প্রত্যাশা করে যে, সে প্রত্যেককে তাহার নির্ধারিত হক আদায় করিবে, প্রত্যেকের প্রতি হিতৈষণা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে এবং এই ব্যাপারে জাতি-ধর্ম বা মুমেন-কাফের, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী—কোনরূপ ভেদাবেধ করিবে না। হুজুর (আইঃ) এ প্রসঙ্গে সৈয়দনা হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের 'উসওয়া হাসানা'—সর্বোত্তম আদর্শ ও দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, হুজুর সাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম-এর পবিত্রতম হৃদয়ে খোদাতায়ালার সৃষ্টিজীবের প্রতি যে সহানুভূতি ও স্নেহ-মমতা উদ্বেলিত ছিল, উহার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার উম্মতের ব্যক্তিবর্গ হিসাবে আমাদিগকেও তাঁহার অনুগমন ও অনুসরণ করা উচিত। আজিকার দুঃখ-দুর্দশা জর্জরিত জগৎ এমন একটি জামাতের মুখাপেক্ষী, যাহারা প্রত্যেকের হক কায়েম করে, তারপর উহা আদায় ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালায় এবং প্রেম ও মহব্বতের সহিত মানব হৃদয়কে জয় করিয়া মুহসেনে-ইনসানিয়াত'—মানবতার শ্রেষ্ঠতম কল্যাণকারী—হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের কদমে আনিয়া উপস্থিত করে। (বক্তৃতার এই পর্যায়ে হুজুরের নির্দেশক্রমে সকল উপস্থিতবৃন্দ "মুহসেনে-ইনসানিয়াত (সাঃ) যিন্দাবাদ, না'রা স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি, প্রেম ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত উত্তোলন করেন)।

পরিশেষে হুজুর বলেন ; এখন আমরা দোওয়ার সহিত আমাদের এই জলসা শেষ করিতেছি—এই দোওয়ার সহিত যে, আল্লাহতায়ালা আগামী বৎসর পুনরায় আমাদিগকে এ জলসায় শামিল হওয়ার বরং অধিকতর সংখ্যায় উপস্থিত হওয়ার এবং অধিকতররূপে ইহার বরকত হাসিল করার তওফিক দিন। যে বন্ধুগণ জলসায় যোগদানের আগ্রহ ও ব্যগ্রতা থাকা সত্ত্বেও ন্যায়সঙ্গত অপরিহার্য কারণ বশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই আল্লাহতায়ালা তাঁহাদেরও ব্যাথা মোচন করুন। এই যামানায় আল্লাহতায়ালা যে সকল মহান সুসংবাদ

ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার সম্পর্কে দান করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অথবা উহাদের অংশবিশেষ হইলেও আমাদের জীবদ্দশায় পুর্ণ করুন, যাহাতে আমাদের আত্মাও আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হইতে পারে। আল্লাহতায়ালা আমাদের নগণ্য প্রচেষ্টা সমূহকে কবুল করুন, উহাদের উত্তম জাযা (পুরস্কার) দিন। তাঁহার সাক্ষাৎ মহব্বত আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করুন, অতঃপর সর্বদা আমাদিগকে তাঁহার সন্তোষ ও প্রীতির পথে পরিচালিত রাখুন। যে সকল মুবাল্লেগ জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের তবলীগে নিয়োজিত আছেন, তাঁহারাও আমাদের আন্তরিক দোওয়ার হকদার—আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহাদের কথায় ও লেখায় বরকত দান করেন এবং তাঁহারা ইসলামের নূরকে বিস্তার দানকারী হন। আমাদের বর্ত্তমান বংশধর দিগকেও তাহাদের মোকাম ও মর্যাদা উপলব্ধি করার তওফিক দিন, এবং আমাদিগকে আমাদের সন্তান-সন্ততির সহি তরবিয়ত করার তওফিক দিন। কুরআন করীম শিক্ষা ও পাঠ করা এবং উহার উপর আমল করার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ উদ্দীপনা আমাদের মধ্যে জাগাইয়া দিন এবং আমাদের প্রত্যেক বংশধর যেন অধিকতর কর্মচঞ্চলতা ও দ্রুততার সহিত ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের রাজপথে আগাইয়া যাইতে থাকে। আল্লাহতায়ালা আমাদের ধন-সম্পদেও বরকত দিন। আমরা যেন তাঁহারই সন্তোষ ও রেযামন্দীর মধ্যে জীবন যাপন করি এবং সেই অবস্থাতেই যেন আমরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। আসুন, এখন আমরা দোওয়া করি।”

তারপর হুজুর দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী এক আবেগপূর্ণ সকরুণ ইজতেমায়ী দোওয়া করান। অতঃপর আহ্বাবকে ফিরিয়া যাওয়ার অনুমতি দান করিয়া বলেন যে, আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলের সফরাবস্থায়ও এবং গৃহবাসেও হাফেজ ও নাসের হউন। আমিন। এই ইজতেমায়ী দোওয়ার সহিত জামাত আহমদীয়ার ৮৫তম সালানা জলসার সমাপ্তি ঘটে।

(দৈনিক আল-ফজল হইতে সংগৃহীত)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

● মোহাম্মাদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মোহাম্মাদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দ্বীপ্তি।
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ।।
['ফারসী দুররে সমীন' —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)]

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : *হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২২)

তৃতীয় যুক্তি-প্রমাণ : দাবীকারকের ব্যক্তি-জীবনের পবিত্রতা

সূর্যই সূর্যের সত্যতার প্রমাণ :

ইতিপূর্বের আলোচনার মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করেছি যে, বর্তমান যুগই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর আগমনের জন্য নির্ধারিত যুগ এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে বর্ণিত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-ই এই যুগের জন্য প্রতিশ্রুত সংস্কারক। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর মাধ্যমে এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন দাবীদার এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার দাবী করেন নাই। সুতরাং তাঁকে অস্বীকার করলে সেই আধ্যাত্মিক বিধানকে অস্বীকার করা হয় যে বিধান অনুযায়ী দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিক সংস্কারকের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূর্ণ হয়। তাঁকে অস্বীকার করলে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী সমূহকে অবহেলা করা হয়।

এখন আমরা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর জীবনী থেকে তাঁর দাবী সংক্রান্ত যুক্তি প্রমাণাদি পেশ করবো। অর্থাৎ তিনি সত্যসত্যই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য ও প্রমাণাদি পেশ করবো। এই সকল সাক্ষ্য ও প্রমাণাদি নানাভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :

(১) যেমন, তাঁর ব্যক্তি-জীবনের পবিত্রতা এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণ উল্লেখ করা যেতে পারে। (২) অথবা ইসলামের জন্য তিনি যে খেদমত পেশ করেছেন, যে সকল কার্য সম্পাদন করেছেন তা পেশ করা যেতে পারে। (৩) অথবা আমরা তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর আলোকে তাঁকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি। তিনি স্বয়ং তার কাজ-কর্ম এবং উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়ন কল্পে আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে কতখানি আধ্যাত্মিক সাহায্য ও সমর্থন লাভ করেছেন। (৪) অথবা তাঁর দাবীর সত্যতার মোহর-স্বরূপ আমরা সেই সকল বিরুদ্ধবাদীর শোচনীয় পরিণামের সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে

পারি যারা প্রকাশ্যভাবে তাঁর শত্রুতা করার ফলে চরমভাবে পরাভূত হয়েছিল। (৫) আমরা তাঁর দাবীর সত্যতা নিরুপণের জন্য তাঁর খোদা-প্রদত্ত লেখনী শক্তি এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বানী সমুহের প্রমাণ-পুঞ্জী পেশ করতে পারি। (৬) অথবা তাঁর দাবীর যথার্থতা সম্পর্কে আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি—আল্লাহ এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর প্রেম ও মহব্বত কত গভীর ও প্রগাঢ় ছিল। (৭) অথবা আমরা পর্যালোচনা করে দেখতে পারি তাঁর জীবন-প্রদায়ী ক্ষমতা কত গভীর ছিল। এরূপ আরো নানা প্রমান, ঘটনা, সাক্ষ্য এবং সফলতার শত সহস্র দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে।

দাবীকারকের ব্যক্তি-চরিত্রের পবিত্রতা-জনিত প্রমাণ

প্রথমতঃ আমরা তাঁর ব্যক্তি জীবনের চারিত্রিক বিশুদ্ধতা সম্পর্কিত সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবো। পবিত্র কোরআনে রয়েছে : فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون

(ফাকাদ লাবেসতু ফিকুম উমরাম্ মিন্ কাবলিহি, আফলা তা'কেলুন)।

অর্থাৎ—"বল, আমি তোমাদের মধ্য হইতে পূর্ব জীবনের একাংশ অতিবাহিত করিয়াছি—তবুও কি তোমরা বুঝিতে পারনা" (সুরা ইউনুস : ১৭)

হযরত রসুল করীম (সাঃ) নবুওতের দাবীর পূর্ব হতেই বিশ্বাসী, সত্যবাদী, সচ্চরিত্রবান সম্মানিত ব্যক্তিরূপে তাঁর সমসাময়িক লোক এবং সম্প্রদায়ের কাছে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কিন্তু নবুয়তের দাবীর পরপরই তাঁর পক্ষে হঠাৎ করে মিথ্যাবাদী বা প্রতারণাকারী হয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে না। সাধারণ প্রকৃতিতে এবং মানব প্রকৃতিতেও কোন বিষয় সহসা পরিবর্তিত হয় না। বরং বলা চলে যে, পরিবর্তনের একটা ক্রম-সূত্র রয়েছে। কারণ পরিবর্তন ধীরে ধীরে সংঘটিত হতে থাকে কতকগুলো মৌলিক পরিসীমার মাধ্যমে। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবন সম্বন্ধে তাঁর জাতির লোকজন সম্যকভাবে অবগত ছিল। কোন মানুষ সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নাই—তিনি আল্লাহ সম্বন্ধে সহসা মিথ্যা কথা বলতে পারেন না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে পূর্ণরূপে জানার ভিত্তিতেই হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন। যখন তিনি শুনলেন যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) নবী হওয়ার ঘোষণা করেছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ হযরতের কাছে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি নবুওতের দাবী করেছেন কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে রসুল করীম (সাঃ) তাঁর দাবীর স্বপক্ষে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন, কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) কোন ব্যাখ্যা শুনতে নারাজ।

তিনি জানতে চাইলেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) নবী হওয়ার ঘোষণা করেছেন কি না? হযরত রসুল করীম (সাঃ) বল্লেন : তাঁর ঘোষণা সত্য। তৎক্ষনাৎ হযরত আবু বকর তাঁর উপর ঈমান আনলেন এবং মুসলমান হয়ে গেলেন। তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে সত্যবাদী বলে খুব ভালভাবেই জানতেন। সেজন্যই এখন যদি তিনি নবী হওয়ার ঘোষণা করে থাকেন তাহলে সেই ঘোষণা জাল বা মিথ্যা হতেই পারে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) অন্য কোন যুক্তি বা নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উত্তম চারিত্রিক বিশুদ্ধতার অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ প্রমানই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল।

অনুরূপ আরো অনেকেই হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে ব্যক্তিগতভাবে উত্তমরূপে জানার ভিত্তিতে সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। হযরত খাদিজা (রাঃ), তাঁর চাচাতো ভাই হযরত আলী (রাঃ), তাঁর মুক্ত ক্রীতদাস হযরত যায়েদ বিন হারেস (রাঃ) অনুরূপভাবে ঈমান আনায়ন করেছেন—যেইমাত্র তাঁরা হযরতের কাছ থেকে তাঁর দাবীর কথা জানতে পেরেছেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ) সর্বপ্রথম ওহী লাভ করার পর যখন হযরত খাদিজা (রাঃ) কে বল্লেন যে, 'নিজের জন্য ভয় পাচ্ছি' তখন হযরত খাদিজা (রাঃ) বল্লেন :

"কিন্তু, ভয় পাবেন না—কারণ, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনই অপদস্থ করবেন না। আপনি আপনার আত্মীয় স্বজনের সংগে ভাল ব্যবহার করেন, আপনি অন্যের দায়িত্ব বহন করে থাকেন, আপনি বহু সদ্‌গুণের এক মহা-দৃষ্টান্ত—যে সকল সদগুনের কথা বহুকাল হতে মানুষ ভুলে গিয়ছিল, আপনি অতিথি ও মেহমানদের প্রতি দয়ালু ও সহনুভূতিশীল এবং সাহায্য-প্রার্থীকে সদা সাহায্যের জন্য তৎপর থাকেন।"

বস্তুতঃ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর দাবীর সত্যতার এক মহাসাক্ষ্য ছিল তাঁর ব্যক্তি-জীবনের বিশুদ্ধতা, তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা। প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবীকারক হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও ও পবিত্রতারও অনুরূপ প্রমাণ রয়েছে। হযরত মীর্যা সাহেব বিরুদ্ধাচারী উগ্রপন্থী হিন্দু, শিখ এবং বিরুদ্ধমতবাদী মুসলমানদের সঙ্গে বসবাস করা সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তি-চরিত্র এবং ন্যায়নিষ্ঠার জন্য তিনি সকলের কাছ হতে সম্মান লাভ করেছেন। পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাদিয়ানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত একটি মিশ্র পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছেন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে অনেকেই তাঁর পরিবারের অধীনস্থ রায়ত ছিল। ইতিমধ্যেই সরকারী শাসনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল এবং শিখ সরকারের

পরিবর্তে ইংরেজ সরকার কায়েম হয়েছিল। ভূতপূর্ব রায়তগণ তাঁর পরিবারের কাছে পুরাতন চুক্তি এবং দায়-দায়িত্বের নিষ্পত্তি দাবী করতে শুরু করলো। সমস্ত গ্রামটিই তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করেছিল। বিভিন্ন আদালতে হযরত মীর্যা সাহেবের উপস্থিতিতে গ্রামের সকল লোক বিশেষতঃ শিখগণ খুবই অসন্তুষ্ট ছিল। কেননা তারা চাইতো না যে, একটি অধিকার-ছিন্ন পরিবার পুনরায় সম্পদশালী হোক, পক্ষান্তরে তাদের কোন ক্ষতি হোক।

অন্যদিকে, ইসলাম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এবং ইসলামের প্রতি তাঁর মহব্বতের জন্যও অন্যান্য ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য বিরোধ দেখা দিয়েছিল। এই সকল প্রতিকূল অবস্থা এবং পারিবারিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি সকলের কাছ থেকে সর্বাত্মক সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর সরল এবং সদ্‌ব্যবহারের জন্য শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে তাঁকে বিশ্বস্ত সঙ্গী বলে মনে করতো। যে সমস্ত ব্যক্তি বা দল তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করত তারা কখনো কখনো তাঁকেই মধ্যস্থতাকারী বা সাক্ষীস্বরূপ গ্রহণ করতো। সবাই জানতো যে তিনি কখনই সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে যাবেন না। শত্রু-মিত্র সকলেরই তাঁর সম্বন্ধে এরূপ ধারনা ছিল।

এ সম্বন্ধে সমসাময়িক কালের একজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী যিনি তৎকালের প্রভাবশালী "ইশায়াত আল-সুন্নাহ" নামক পত্রিকার সম্পাদক এবং "আহলে হাদীস" সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি হযরত মীর্যা সাহেবের সংগে একই শিক্ষকের কাছে লেখা-পড়া করেছিলেন। বস্তুতঃ হযরত মীর্যা সাহেবকে তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন। হযরত মীর্যা সাহেবের সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক "বারাহীনে আহমদীয়া" প্রকাশিত হওয়ার পর মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত পুস্তক সমালোচনার অভ্যন্তরে তিনি যা লিখেছেন তা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য :

"বারাহীনে আহমদীয়ার লেখক আমাদের নিকট সুপরিচিত—তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর অবস্থাদি সম্বন্ধে অন্যান্য প্রায় সকলের চাইতে আমরাই অধিকতর ভালভাবে অবগত। অল্প বয়সে তিনি আমাদের সংগে একই কোর্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একই শিক্ষকের নিকটে আমরা "কুতবী" এবং শারাহ মুল্লা অধ্যয়ন করেছি। সেই সময় থেকেই আমরা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছি।" (এশায়াত আল সুন্নাহ পত্রিকা, খণ্ড ৬, নং ৭, দ্রষ্টব্য)।

এইভাবে পাঠককে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুনিশ্চিত প্রমাণ দেয়ার পর অর্থাৎ হযরত মীর্যা সাহেবের সংগে তার সম্পর্ক লোকমুখে শোনা কথার মত মামুলী বিষয় ছিল না, এবং ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘদিনের পরিচয় ও যোগসূত্রের অকাট্য যুক্তি পেশ করায় পর তিনি পুনরায় লিখেছেন :

"এই পুস্তক (অর্থাৎ বারাহীনে আহমদীয়া) এক অতুলনীয় সম্পদ। আমাদের সময় ও প্রয়োজনের বিবেচনায় ইসলামের ইতিহাসের ইহা একটি সমকক্ষহীন পুস্তক। আর ভবিষ্যত সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহই সত্যকে জানেন।

গ্রন্থকার (অর্থাৎ হযরত মীর্যা সাহেব) সম্বন্ধে একথা অনস্বীকার্য যে তিনি যেভাবে ইসলামের প্রতি অনুরাগ ও মহব্বত প্রদর্শন করেছেন, যেভাবে তাঁর কলম, এবং যতখানি বক্তৃতা ও কথাবার্তায় ততখানি নিরবতা দ্বারা ইসলামের একনিষ্ঠ খেদমত করেছেন— খুব কম লোকই এরূপ করতে পেরেছেন। এশিয়াবাসীদের ন্যায় যদিও আমরা অতিরঞ্জিত করতে প্রয়াসী বলে আখ্যায়িত—তবুও অন্ততঃ এই একটি পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের মানতেই হবে যে পুস্তকটির লেখনী শক্তি এবং প্রভাব ইসলামের শত্রু, আর্য এবং ব্রাহ্মদের যথার্থভাবে উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে। আসুন, আমরা দেখি এমনিভাবে আর কেহ—একজন, দুজন অথবা আরো বেশী লোক ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছেন কি না।" (ইশায়াত আল সুন্নাহ, খণ্ড—৬, নং ৭)

এই মহ-প্রশংসাকারী লেখক অর্থাৎ মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী পরবর্তী কালে হযরত মীর্যা সাহেবের বিরুদ্ধাচারনে নেতৃত্ব দান করতেও কার্পন্য করেন নাই। মীর্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মৌলভী বাটালবী সাহেব কুফরী ফতওয়া লাগাতে এবং তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতারক বলে আখ্যায়িত করতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

অর্থাৎ তিনি ঠিক সেইভাবেই হযরত মীর্যা সাহেবের সঙ্গে ব্যবহার করছিলেন যেভাবে মক্কার অস্বীকারকারীগণ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সংগে ব্যবহার করেছিল। মক্কার প্রত্যাখানকারীরাও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নবুয়তের দাবীর পূর্বে তাঁকে "বিশ্বস্ত" ও "সত্যবাদী" বলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আখ্যায়িত করেছিল। বস্তুতপক্ষে, পরবর্তী কালের বিরোধিতার পশ্চাতে কতকগুলো পার্থিব স্বার্থ নিহিত থাকে। এই বিরোধিতা মূলতঃ দাবীর বিরুদ্ধে এবং দাবীর দ্বারা সূচিত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত কুরআন করীমের এতদসংক্রান্ত আয়াতটিতে (সুরা ইউনুস : ১৭) এই ধরণের বিরোধিতার অসারতা এবং অযৌক্তিকতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমাগত দাবী-কারকের সত্যতার সাক্ষ্য-স্বরূপ দাবীকারকের চারিত্রিক বিশুদ্ধতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে তৎকালীন সমাজপতিরা সত্যবাদী, সাধু এবং সম্মানিত

রূপে প্রথমাবস্থায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষ রায় প্রদান করেছিল তখন সেই রায়ের মধ্যে কোন স্বার্থ ছিল না। কিন্তু দাবীর পর যখন তারা দেখলো যে, তাদের স্বার্থে আঘাত লাগছে, তখন তারা বিরোধিতা করতে লাগলো এবং তাঁকে অন্যভাবে বিচার করতে লেগে গেল। খোদা-প্রদত্ত মানবীয় প্রকৃতিও এই ধরনের অপ্রাসঙ্গিক চারিত্রিক পরিবর্তন নীতির বিরুদ্ধে একটা বিরাট রক্ষাকবচ স্বরূপ। যে ব্যক্তি বহুকাল ধরে অন্য লোকদের সঙ্গে বসবাস করে এই কথার সুস্পষ্টরূপে প্রমান দান করেছেন যে, সমস্ত প্রকার লোভ-লালসা এবং পরীক্ষার মধ্যেও তাঁর চরিত্র কলঙ্কহীন ও অম্লান ছিল— সেই ব্যক্তি খোদাতায়ালার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের ব্যাপারে কোনক্রমেই সত্যবাদীতা এবং বিশ্বস্ততা ব্যতিত অন্য কিছুই প্রকাশ করতে পারেন না।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের জন্য এই যুক্তিই পেশ করেছিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে কি ইতিপূর্বে সত্যবাদী ছাড়া অন্য কোন রূপে দেখেছিল? যদি তাই হয়ে থাকে তবে তারা সেই দাবীর কথা বলুক এবং প্রমাণ দিক। অনুরূপভাবে হযরত মীর্যা সাহেব মিথ্যাবাদী শত্রুদের চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে, তাঁর দাবীর পূর্বে তাঁরা কি তাঁকে সৎ ও সত্যবাদী, নিষ্ঠাবান মুসলমান বলে রায় প্রদান করে নাই? যে ব্যক্তির ব্যক্তি-চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে হিন্দু, শিখ, খ্রীষ্টান এবং মুসলিম প্রতিবেশী ও পরিচিত ব্যক্তিগণ কখনই কোন প্রশ্ন তুলে নাই, সেই ব্যক্তি পরিপক্ক বয়সে সহসা প্রতারণা ও কুফরীর পথ বেছে নিলেন কেমন করে? প্রকৃতপক্ষে, দাবীকারকের ব্যক্তিগত জীবনের বিশুদ্ধতা এবং নিষ্কলঙ্কতার এই প্রমান, যা তাঁর শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে পেশ করেছে— সেই প্রমান তাঁর দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে একটি সুস্পষ্ট যুক্তি। আর এই যুক্তিই হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সত্যতার সাক্ষ্য স্বরূপ কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ হওয়ার দাবীকারক হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ তাঁর দাবীর সত্যতাকে মোহরাঙ্কিত করেছে। (ক্রমশঃ)

(দাওয়াত ুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ: মোহাম্মদ খলিলুর রহমান)

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৪তম সালানা জলসা

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৪তম সালানা জলসা আগামী ১৯ ও ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ইং, মোতাবেক ৭ ও ৮ই ফাল্গুণ ১৩৮৪ বাংলা, রোজ রবি ও সোমবার অনুষ্ঠিত হইবে। জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সকল সত্যান্বেষীর যোগদান একান্ত কাম্য।

—জলসা কমিটি

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া, কুমিল্লা

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca –1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar